নাহার মনিকার একগুচ্ছ কবিতা

দরোজা

দরোজা কেমন করে ভাঙ্গে তার
নিজস্ব কপাট, কবিতার বৃত্ত আর
অসার বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়িয়ে ক্রমাগত
সেলে রাখে বাহুর দাওয়াত,
বেশী বালিকার মত শ্বাস-
বন্ধ দৌড়, দু'হাতের মধ্যভাগে ত্রাস
আর ক্ষীণায়ু ঘাম, হাত থেকে
ধারালো করাত এঁকে বেঁকে
কখনো কখনো কাটে - দরোজার
সমূল উত্থান- কেটে চলে তার
সাবধানে খুলে রাখা একা স্বাধীনতা
দূরের দৃশ্যের মত দারুণ স্বচ্ছতা
আর ঠিক তক্ষুনি দরোজার বন্ধ দু'হাত
অসামান্য বাতাসের ছোটলোকি দাঁত
পিষে ফেলে, সুন্দর আক্রোশ
দরোজার দু'হাত খোলে না। আবার না ক্রোশ
পথ পাড়ি দিতে হয়। বাতাসের সঙ্গে কি
যুদ্ধ যুদ্ধ সাজে? আসলে তো
দরোজার দরকার শুধু - নিজস্ব কপাট ও
কবিতার বৃত্ত আর সচল আঙুল
শুধু চাই খোলা আর বন্ধের ঠিক-ভুল
নিজস্বতা চাই।

সংজ্ঞা

বুকের মধ্যে ভালোবাসার সুর
আনকোরা এই সুদূর অবেলায়
ঘিরে আছে বিশাল সমুদ্দুর
মূহুর্মূহু বাজাচ্ছে বিস্ময়।

চিনতে হলে পাথর থাকে বাকী
মোহনাতে নদীর জলে পূজায়
দিগন্তে হয় রঙধনুদের মেলা
কাঁপিয়ে দিতে সাতাশটি বৈশাখী।

ভালোবাসার ভাবনা নিরঙ্কুশ
সাতশো সাপের পাহাড়া তার পায়
তা সত্ত্বেও ভক্ত-পাখির দল
ভয় না পেয়ে কেবলি চমকায়।

রোজ নামচা

জানালার পুরু কাঁচ গলে এক টুকরো
সূর্যালোক, আমার পায়ের পাতায়
মৃদু উষ্ণতা দিয়ে হাসে।

মধ্যাহ্ন ভোজন আর রমণের পর
কর্মক্ষেত্র বিবমিষাময়
মনে হয় -
কিনা, পরখের সুযোগ হয়নি,
তবুও উল্টে পাল্টে যায়
বসবাস। ভালোবাসার প্রখর অভ্যাস
তৃষ্ণার মত দেহের আর্দ্রতা ঢাকে মেঘে
কেবল শুকনো থাকে ঠোঁট।

সেই ফাঁকে আমি
বন্ধুবৎ দুই ওষ্ঠ
চেপে চেপে লিখে ফেলি
শৈশবের শেখা সকল নামতা।

অবাক জলপান

কণ্ঠনালীতে নির্বিষ জল আটকে আছে,
ঘন গভীর বিস্ময়রাশি আমার
বুকের সীমানা ছুঁতে পারছে না।
আমি কেবল গলার কাছে
অসিদ্ধ একরাশ ক্বাথ নিয়ে
অর্ধমৃত সাপের মত ফণাতোলার
ব্যর্থ চেষ্টায় আছি।

হৃদয়ের কাছে জলের দূরাশা
ক্রমশ বাড়ছে। কণ্ঠের কাছে
লালনের গান, গানের উপমা
সমাধানহীন অগুনতি ঢোক।

জলকে গোনার মন্ত্র জানি না আমি
কণ্ঠনালীতে আটকে থাকা
অবাক জলের দ্রুত ঘনত্ব মাপি।

মন্ট্রিয়ল, কানাডা

ওমর আলীর কবিতা

মৃত চোখ দুটো

শল্যবিদের চাকু এসে মৃত চোখদুটো তুলে নিয়ে যায়
এক সময় কত সুন্দর দেখতে
ঐ সূর্যাস্ত ঐ বেলাভূমি তরঙ্গিত নদী
শহরের রাস্তার মধ্যেও যুগলপাহাড় চূড়া
কত সুন্দর ঐ দৃষ্টির সমুদ্র গভীরতা
আহ কী সুন্দর ফুটে আছে শুধু বাগানেই নয়
ঠোঁটেও যেন রঙধনুর লাল রঙ
কিংবা রাশিরাশি সাদা যুঁই শারদ জ্যোৎস্না
দেখে ভাল লেগেছিলো
বুক কিংবা বুকের পশম দুহাতের চুল
গাছপালাহীন মরুভূমিতে যেয়ে এ সবুজের
সুন্দর দৃশ্য ফুটে উঠেছিলো দুই গোল আয়নায়
এত নদীর পানি অসহ্য ঠেকেনি মরু ভূমিতে যেয়ে
পোশাক ভাল লেগেছিল গাল ওষ্ঠাধর আর
অত সুন্দর তাকানো ভাল লেগেছিলো
এরপর শল্যবিদের চাকু যখন এক একটি চোখ স্পর্শ করলো
তখন শেক্সপীয়ার গ্যেঠে রবীন্দ্রনাথ ওমর খৈয়াম ও নজরুলকে
বোঝার মতো বোধশক্তি একেবারেই শেষ হৃদপিণ্ডে কাজ করছে না
অতএব দেখার মতো আর বোধশক্তি নেই
যেন কোন ইনজেকশন দিয়ে ব্যথা বেদনা সব সরানো হয়েছে
শল্যবিদের চাকু শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে দুটো চোখই উপড়ে তুলে নিলো
মৃত দেহ একটুও বুঝতে কিংবা অনুভব করতে পারলো না
গোলাপ দেখতে ভালো লাগতো
মানুষকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে ভালো লাগতো এতো যেন বারবার দেখেও হয় না তৃপ্তি
বারবার পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে দেখার পরেও দেখতে ইচ্ছে হয় যে চোখ দুটো দিয়ে শল্যবিদের
চাকু এসে সেই চোখ দুটো নিখুঁতভাবে তুলে নিয়ে গেলো...
কিন্তু না মৃত চোখদুটো আবার জীবিত হলো প্রাণ ফিরে পেলো আবার আগের মতোই সব কিছু দেখতে থাকলো
যে কিছুই দেখতে পেতোনা সেও এখন দেখছে আকাশের আশ্চর্য কারুকাজ আনন্দে উঠছে বিভোর হয়ে
মানুষ তাহলে এত সুন্দর... কী আশ্চর্য এত সুন্দর সুন্দর মানুষ এখানে পৃথিবী তাহলে এত সুন্দর প্রকৃতির এত সুন্দর ঐশ্বর্য
ধন্যবাদ তোমাকে চক্ষু ব্যাংক...
মৃত চোখ দুটো কেবলমাত্র পুরনো খোলস বদলিয়ে নতুন জীবন নতুন খোলস পেলো...
একটা গোপন কথা
আগে নারী ছিলো এখন পুরুষ রীতিমতো মুখে দাঁড়ি গোঁফ
আগে পুরুষ ছিলো এখন নারী বুকে হাত দিয়ে উঁচু
বল্মীকের মতো কিছু ঠেকে
আগের জনের অর্থাৎ নারীর আশাই বেশি পূরণ হলো
সে একবার পুরুষ হতে চেয়েছিলো
শেষের জন অর্থাৎ পুরুষ কিছুটা বিমর্ষ নারী হবার কারণে
যাক তবু তো চোখ পেয়েছে দেখতে পাচ্ছে...
তাছাড়া আগে বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ অবসাদগ্রস্থ
এখন সতেজ উৎফুল- যুবক যুবতী
যেন জীবনকে উপভোগের জন্যে যযাতি ফিরে পেয়েছে যৌবন...

০৬.১৩.২০০১

মাতৃমূর্তি ক্যাথিড্রাল

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

মাতৃমূর্তি ক্যাথিড্রালে আমরা হাঁটু গেড়ে পাশাপাশি। প্রার্থনার ভঙ্গিতে ফিসফিস আলাপ। সরু-নীল-পাড়, শাদা নান্‌-এর থান ওর পরনে। কিন্তু ও নান্‌ নয়। আমার পরনে যথারীতি কালো। প্রতিটি *মিসা*-ই যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এসব কে দ্যাখে, কে ভাবে, কে বোঝে। এরা কি সবাই নয় দাঁড়িয়ে-থাকা শব শুধু গুয়াতেমালার ক্যাটাকোমে? এমনকি যাজকসুদ্ধ? যে-প্রার্থনাধ্বনি উত্থিত, ঘুলঘুলি-পথে ঢুকছে যেন তা চুপিচুপি, - অন্য কোনো পৃথিবীর থেকে - বাইরে থেকে। আমরা দু'জন শুধু বেঁচে। কথা বলছি - যদিও, যে-বাতাবরণটি আমাদেরকে মুড়ে আছে এক ধোঁয়াশা-ধুষর বোরকার মতো, তাকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না-ক'রে। ... গোরস্তানে অভিসার। প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস। ফাঁকে ফাঁকে জীবাত্মার ফিসফাস। কিন্তু কেউ কা'রে করবে না ব্যাহত। এ-খেলার এটাই নিয়ম। কিন্তু আমরা কি কথাই কইছি? না প্রার্থনাই করছি? যদি কেইন আর এবলের মতো যজ্ঞ আমরা করতাম? সারিসারি রাশিরাশি অর্থহীন আনীল ধূসর ধোঁয়ার কলোনেড-স্বর্গপানে ধাইছে, কুন্ডলী পাকাচ্ছে, আবার খুলে পড়ছে... মধ্যে থেকে দু'টো শাদা ধোঁয়ার রশ্মি সোজা উঠে গেল, গির্জার ছাদ ভেদ ক'রে গেল - ঈশ্বরের চোখের মতন দু'টো ফুটো ক'রে উপরে... উপরে...

ওর বাপ মদ্যপ। বউ পেটায়। আর ওকে এখন রবিবার ছাড়া বের হ'তে দেয় না। রবিবার গির্জায় ও নান্‌ সেজে আসে। সেটাও -- ওর বাপের খুশি কিনা বলেনি। আমিও প্রশ্ন করি নি। কক্ষনো করি না। আমরা কেউ করি না প্রশ্ন পরস্পর-কে, কাউকে। আমরা বলি শুধু, বা উত্তর দিই, কনফেশন-এর মতো। কিন্তু "মেয়া কুল্পা" কক্ষনো নীরবে উচ্চারণ আমরা করি নি। আমরা নিষ্পাপ , তা-ই বুঝেছি এযাবৎ। ভেবেই পাই না, ফাদার কেন যে কনফেস করতে আমাদের শেখালেন! কনফেস করার জন্যেই কি পাপ করা দরকার তাহলে? কিন্তু ওর বাবাও "মেয়া কুল্পা" কখনো বলেনি। কীভাবেই বা বলবে? সে তো গীর্জায় কখনো আসে না। গীর্জা ছাড়া "মেয়া কুল্পা" বলবে কোথায়? শুধু ওর দিদা-র কথাটাই আমাকে দিতেই হয় মনে করিয়ে। ও-ও ভুলে যায়। ও-ও। এদের বিরাট, মৌচাকের মতো বাড়িটার শুধু একটা ঘর ওর দিদা-র। সে-ঘরের দোর কখনো খোলে না। খাবার সময়, জানালা-পথে পরিবেশন করে দাসি। কত বছর জানে না ও। ভুলেছে সবাই।

ক্রুসিফিক্সের নিচে, *মিসা*-শেষে অতিরিক্ত কিছুক্ষণ আমরা প্রার্থনার ভঙ্গি করি। কিংবা প্রার্থনাই করি। শেখানো প্রার্থনা মুখে গরগর করি, আর মনে-মনে বলি অন্য প্রার্থনা। "কেউ" বলতে পারবে না যে প্রার্থনা আমরা করি নি। ... একদিন স্কুলে, যখন ও-ও স্কুলে যেত, সিস্টার দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করলেন আমাদের, কেন আমরা কথা বলছিলাম? আমরা মিথ্যা বলবার ভয়ে, ঈশ্বরের ভয়ে, কথা বলি নি তখন। তখন আমাদের তিনি বের ক'রে দিলেন। আমাদের ক্লাসটা ছিল দোতালায় পার্শেই - না খোলা একটা ছাদ। সোজা আমাদের জিনিথের নিচে দাঁড়িয়ে, মুখামুখি আমরা হাসলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। সিস্টার-কে ধন্যবাদ দিলাম। কেননা, কী আশ্চর্য সেই মুহূর্ত, যখন আমরা সমান অপরাধে সমান দন্ডে দন্ডিত, সমান আনন্দে আনন্দিত! আর দ্যাখো! আমরা কথা বললাম না তখন! সমস্ত অধিকারই ছিল যখন কথা বলার, - বহিস্কৃত, দণ্ডিত হয়ে - স্বাধীনতা ছিল - আমরা শুধু চুপ করলাম। যেন অপরাধ আমরা স্বীকার করেছি, প্রায়শ্চিত্ত করছি... কিন্তু জানতেন ঈশ্বর আমরা জানতাম, তা নয়। আর, কেনই আমাদের বের করলেন সিস্টার? কথা বলবার অপরাধে? না-বলবার অপরাধে?

একদিন না, আমরা গির্জার পিছনে যে গোরস্তানটা তার ভিতর দিয়ে হাঁটছিলাম। কেউ বকে নি। গোরস্তানে কেউ বকে না কাউকে। গির্জায়ও না। আমাদের মাথার সমান উঁচু উঁচু সেখানে ঘাস। আমি তুলার মতন ঘাসফুলগুলিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা তোড়া বেঁধে ওকে দিই। ও কিন্তু দিয়ে দিল সেটা একটা কবরে। আমার আপত্তি হ'লেও কিন্তু আপত্তি করা হ'ল না। মৃতদের দিয়ে-ফেলা কোনোকিছুই ফিরিয়ে নিতে নেই। পাপ হয়। ভাগ্যিস, আমরা *কী-কী* করলে পাপ হয় জানি। *তা-তা* করি না! ❑

সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

ভুবন মোহন মিত্রের চলে যাওয়া

রাকিব হাসান

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী আমি প্রথম মঞ্চে উঠে কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেই। তাও ঠিক আবৃত্তি নয়। অভিনয়! কবর কবিতায় দাদুর সঙ্গে নাতির অভিনয়। সেদিন মঞ্চে আমাকে যে অভিনয়টুকু করতে হয়েছিলো তা হলো, দাদু যখন বলেন - "হেসোনা হেসোনা শোনো দাদু সেই তামাক মাজন পেয়ে, দাদী যে তোমার কতো খুশী হতো দেখতিস যদি চেয়ে" আমি তখন দর্শকদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসি এবং দ্বিতীয়বার "কাঁদছিস তুই কি করিবি দাদু পরান যে মানে না" তখন আমাকে কাঁদতে হয়েছিলো। এখানে বলে নেয়া ভালো ঐ সময় আমার বয়স ছিলো সাত বছর। অভিনয় ক্ষমতা দিয়ে তখন আমার পক্ষে হাসা সম্ভব হলেও কাঁদানো সম্ভব ছিলনা। এ কারণে আমি এক টুকরো পেঁয়াজ হাতে নিয়ে মঞ্চে উঠেছিলাম। কান্নার সময় পেঁয়াজের টুকরোটি দিয়ে এমনভাবে আমি চোখ ঘষেছিলাম যে দর্শকরা ভেবেছিলেন আমি কান্নার অভিনয়ের জন্য হাত দিয়ে চোখ ঘষছি। যখন হাত নামিয়ে আনি তখন দুই চোখ ছিলো কবর কবিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আবেগের জলে ভরা। দর্শকরা এই জল পরা দেখে আমার দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিলো।

আর এই দিন আমি বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকি একজন গণসঙ্গীত শিল্পীর দিকে। তিনি পর পর তিনটি গান গাইলেন- "ভয় কি মরনে রাখিব সম্মানে", "কারার ঐ লৌহ কপাট" এবং "শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল।" তাঁর ভরাট কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বাংলার চিরায়ত বিদ্রোহের নিরন্তর রোষাণল। আমি প্রথম অনুভব করি গানেরও সূর্যের মতো শক্তি আছে যা মানুষকে উজ্জীবিত করে। হয়তো একারণেই ওই দিনের পর থেকে আমরা গ্রামের সাত আট বছরের কিশোর কিশোরীরা রাস্তায় মিছিল করতাম "জয় বাংলা" বলে বলে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিতাম আমি। আমাদের কোনো মাইক ছিলো না বলে বৈঠক খানায় এক দরবেশের ফেলে যাওয়া হুক্কার কলকি আমরা মাইকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতাম।

শুধু মিছিল করে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এরপর মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানী সৈন্য দু'দলে বিভক্ত হয়ে আমরা যুদ্ধ করতাম। আমাদের অস্ত্র ছিলো বর্শার মতো সরু ডাল। মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতৃত্ব দিতাম আমি। আর পাকিস্তানী বাহিনীর নেতৃত্ব দিতো হুক্কার কলকি ফেলে যাওয়া দরবেশের ছেলে। আমাদের বাড়ির পেছনে খালের পাশে নির্জন ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে আমরা খেলতাম। একদিন এক অঘটনও ঘটে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন হঠাৎ এক উত্তেজিত মুহূর্তে পাকিস্তানী বাহিনীর প্রধানকে এক ঝোপের ভিতরে লুকানো অবস্থায় পেয়ে যাওয়ার পর সে যখন আমার চেয়ে উচ্চস্বরে শব্দ করে উঠে আমি ডালের সরু অংশ তার এক চোখের ভেতর বসিয়ে দিই। কেননা আমাদের শর্ত ছিল লুকোনোদের খুঁজে বের করার পর তারা আত্মসমর্পণ করবে। দরবেশের ছেলে তা করেনি বলেই আমার সেই শর্তহীন নির্যাতন তার উপর চেপে বসেছিল। তার সৌভাগ্য নাকি আমরা জানিনা, ডালের সরু অংশটি তার চোখে না লেগে লেগেছিল তার নাকের এক পাশে। খবর জেনে বড়রা ছুটে এলে আমি ঐ বিকেলে রীতিমত আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই।

এই এতটা গল্প বলার মানে এই যে, আমাদের এই মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার অনুপ্রেরণা যার কাছ থেকে পাওয়া- সেই গণসঙ্গীত শিল্পী ভুবন মোহন মিত্র আমাদের বরিশালের পাথরঘাটার ঘাট থেকে তার নোঙর তুলে পালিয়ে গেছেন পশ্চিম বঙ্গে। এই পলায়ন কোন অপকর্ম করে নয়, জন্মভূমির বর্তমান সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে। কিন্তু কেন ? যিনি যুদ্ধের সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি তিনি স্বাধীন জন্মভূমি ছেড়ে কেন পালিয়ে গেলেন ? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর সম্ভবত: আওয়ামী লীগের রাইট টার্ন। আজীবন ধর্মনিরপেক্ষতার বুলিতে বলিয়ান আওয়ামী লীগ যখন ধর্মের লেবাসে নতুনভাবে ক্ষমতায় আসে তখন সঙ্গত কারণেই সংখ্যালঘুদের শেষ আশা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। হয়তো এ কারণেই ভুবন মোহন মিত্র ১৯৯৮-এ দেশ ছেড়ে চলে যান শেষ পর্যন্ত।

দীর্ঘ একটা সময় প্রবাসে কাটানোর পর ২০০০ সালে আমি দেশে ফিরে আসি এবং আমার গ্রামে ফিরে যাই। আমার শৈশবের বন্ধুদের খুঁজে বেড়াই। অনেককেই পেয়ে যাই। আচমকা একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। আমার শৈশবের হিন্দু বন্ধুদের অনেকেই নেই। অসীম, কানাই ও হেনা সবাই পশ্চিম বঙ্গে চলে গেছে। আমার এক মুসলমান বন্ধু মিলনের কাছে ভুবন মোহন মিত্রের যাওয়ার খবরটা শুনি। আমরা একটি দীঘির পাড় দিয়ে হাঁটছিলাম। একটি খালকে ভরাট করার পর তার বাকী অংশ এই দীঘি। খালের এক পাশেই আমাদের এবং অন্য পাশে বেশ কয়েকটি হিন্দু পরিবারের বাড়ী। এই হিন্দু পরিবারগুলোর এক অংশে ছিল ভুবন মোহন মিত্রের বসবাস। আমরা তার ঘরের সামনে শান বাধানো সিঁড়ির উপর গিয়ে বসি। আমি আবার নিজেকে প্রশ্ন করি- তিনি কেন চলে গেলেন! এই পাথরঘাটায় তার ছিল বড় ধরনের ফার্মেসীর ব্যবসা। সুন্দর একটি বাড়ী আর দুই ছেলে এক মেয়ে ও স্ত্রী সহ পরিপাটি একটি সংসার। তিনি ছিলেন আমাদের পল রবসন কিংবা ভূপেন হাজারিকা। এই রকম সুখী আর সম্মানিত সেই মানুষটি তাহলে কেন চলে গেলেন? তিনি এখানে যা ফেলে গেলেন তা পশ্চিমবঙ্গে তাঁকে পেতে দুই জীবন ব্যয় করতে হবে। আমি দুই রকম কষ্ট পেতে থাকি। প্রথম কষ্ট ভুবন মোহন মিত্র আমাদের মাঝে নেই বলে। দ্বিতীয় কষ্ট তার গন্তব্য বিহীন জীবনের জন্যে। যেখানে জীবনের নিশ্চয়তা পাবেন জেনে তিনি চলে গেছেন সেখানেওতো "বাঙ্গাল" নামক একধরনের গঞ্জনা তাকে চিরদিন মাথা পেতে নিতে হবে। এই সব কষ্টের পাশাপাশি অন্য একটি অনুভব আমার ভেতরে আমাকে পোড়ায়, তাহলো লজ্জা। যদি কোনো দিন ভুবন মোহন মিত্রের সঙ্গে আমার

দেখা হয় আমি কি ঠিক আগের মতোই তাঁকে জিজ্ঞেসা করতে পারবো "দাদা কেমন আছেন"?

আমি আমার বন্ধুটিকে প্রশ্ন করি তার যাওয়ার আগে এমন কিছু কি ঘটেছিল যাতে তিনি চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন? বন্ধুটি বললো "তোর কি ধারনা আমরা এখনো সেই আমাদের স্কুল জীবনের সমাজ আঁকড়ে ধরে বসে আছি ? সবাই বদলে গেছে। সমাজ বদলে গেছে। যুবক কিংবা বয়স্কদের কথা রাখ, এমন কি রবীন্দ্রনাথের সেই ছুটি গল্পের ফটিকরাও এখন পাখী কিংবা ঘুড়ি ছেড়ে অস্ত্র এবং চাঁদাবাজীতে নেমে গেছে। আর এদের সহজ টার্গেট হিন্দু-মুসলমান সকলেই, তবে হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রশাসন কিংবা স্থানীয় নেতারা এক ধরনের নীরব ভূমিকা পালন করে।" ভুবন মোহন মিত্র কি এই পীড়নের কারণেই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন! মিলন এ-ও জানালো ভুবন মোহন মিত্রের পালিয়ে যাওয়ার পর সবাই জানতে পেরেছে যে, স্থানীয় একজন নেতা তার বাড়িটি কিনে নিয়েছেন। কিন্তু ভুবন মোহন মিত্র কি এর সঠিক মূল্য পেয়েছেন? সে প্রশ্ন শুধু আমার নয়, আমাদের এলাকার সকলের।

অর্থ মূল্যের ব্যাপারটি নিয়ে আজকাল সবাই বড় বেশি ভাবছে। কারণ আজ যার যতো অর্থ তার ততো সম্মান এবং এই সম্মানিত "বাংলাদেশী"দের আর এক অস্ত্র আজ ধর্ম। এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের দেশে কিনা হচেছ ? বাংলাদেশ শুধু মুসলমান দেশ হবে, হিন্দুরা এখানে বসবাস করলে মুসলমানদের সওয়াবের বিঘ্ন ঘটে এমন আমার মনে হয় না। আজকে যারা ধর্মের অস্ত্র হাতে নিয়ে বাংলাদেশকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে তাদের ধর্মীয় কোন মূল্যবোধ আদৌ আছে কিনা তা সবার ভেবে দেখা দরকার। এরা শুধুই অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখল আর মুসলিম কিছু দেশ থেকে ধর্মীয় রাজনীতির কারণে নিয়মিত বড় অংকের অর্থের জন্য রাজনীতি করে যাচ্ছেন। এখানে মূল্যবোধের কোন বালাই নেই। আমরাতো দেখেছি আমাদের পূর্ব পুরুষরা কিভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ দিয়ে একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করেছেন। সেই সমাজ ব্যবস্থায় মসজিদে মিলাদের মিষ্টি আসতো হিন্দুদের দোকান থেকে। মুসলমান আর হিন্দুদের ধর্মীয় সব উৎসব মিলে পূর্ণ হতো বাংলাদেশের প্রতিটি বছরের অপূর্ব এক সামাজিক চিত্র। আমাদের স্কুলের মিলাদুন্নবী পালনের ফিরনী আমরা হিন্দু বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতাম আর হিন্দু বন্ধুরা ওদের সরস্বতী পূজার লুচি আর মিষ্টান্নের জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ দিত। একই হাঁটে হিন্দু মুসলমানদের উৎপাদিত সামগ্রীর মেলা বসে যেত। সেখান থেকে মুসলমান ছেলেদের ধরা মাছ চলে যেতো হিন্দুদের বাড়িতে আর হিন্দু বাড়িতে বেড়ে উঠা হাঁস মুরগী চলে আসতো মুসলমানদের বাড়িতে। এভাবে বদল হতো আমাদের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তার সব সামগ্রী। যেখানে মানুষ মানুষের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতো। নির্ভরতার বিশ্বাসে কেউ কখনো আঘাত করেনি। আমার মনে পড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অসংখ্য হিন্দু পরিবার মুসলমান বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। তখন তাদের সেই নির্ভরতার বিশ্বাস ছিল, যা আজ নেই। মূলত এ কারণেই ভুবন মোহন মিত্ররা আমাদের ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আমরা ক'জন ভাবছি এই সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়টি নিয়ে ? আমরা আমাদের কোরবানীর জন্য ভারত থেকে আজো হিন্দুদের গরু গুলো চাই। আমরা চাই গঙ্গার হিন্দু জল। যা না হলে আমাদের মুসলিম নদীগুলোর প্রজনন ক্ষমতা মরে যাবে। কিন্তু আমরা হিন্দু মানুষগুলো চাই না- এ কেমন চাওয়া ?

আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষই আগে মানুষ তারপর মুসলিম কিংবা হিন্দু। কেননা আমরা একেক জন একটি মানব শিশু হয়ে জন্ম নেই। তারপর আমাদের কানে আজান কিংবা শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে ধর্মান্তরিত করার পর্ব শুরু হয়। ভুবন মোহন মিত্ররা চিরদিন আমাদের মিত্র হয়ে থাকুন এবং আমরাও যেন তাদের মিত্র হয়ে থাকতে পারি - আমি এরকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করি তাঁর ফেলে যাওয়া ঘরের শান বাঁধানো সিঁড়ির উপর বসে - আর তার প্রিয় বকুল গাছের ফুল ঝড়া দেখি। গন্ধে মৌ মৌ করছে সারাটা উঠন। বাড়িটি যিনি কিনে নিয়েছেন তিনি এখনও নতুন বাড়িতে উঠেননি। যখন উঠবেন তখন বকুলের পাশে রক্ত জবা আর তুলশি গাছ দু'টোকে নির্ঘাত কেটে ফেলবেন। শুধু বকুলটাই থেকে যাবে। ❑

রাকিব হাসান
মন্ট্রিয়ল, কানাডা।

এখানে উলে-খ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় প্রণীত শত্রু সম্পত্তি আইন নামে যে অভিশপ্ত কালো আইনের করালগ্রাসে সংখ্যালঘু সমাজের একটা বড় অংশের বিষয়সম্পত্তি সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের ভোগ দখলে যায় এবং যার পরিণতিতে তাদের অনেককেই সর্বস্বান্ত হয়ে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে হয়েছিল প্রিয় স্বদেশ ছেড়ে, সেই আইনটি, সংখ্যালঘু সমাজ ও বাংলাদেশ এর ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল মহলের দীর্ঘদিনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩শে এপ্রিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিলোপ ঘোষণা করেন এবং সেই আইনের অপপ্রয়োগে ক্ষতিগ্রস্থদের জমি ফিরিয়ে দেয়া সহ ক্ষতিপূরণের বিধান জারি করেন। আমরা আশা করবো সরকারের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হৃত অবস্থা ও মনোবল ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে এবং তারা সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন পূর্ণোদ্যমে।
- সম্পাদক।

স্বরব্যাঞ্জনের বিজ্ঞাপন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতা

২৪ মে, ২০০১। ৬ষ্ঠ বাংলা সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে লস এঞ্জেলেস-এ আসা। সন্ধ্যা থেকেই লোকজন আসা শুরু হয়েছে। দিনের বেলাটা ছিল চুপচাপ – লোকজন নেই বললেই চলে। পড়শী'র স্টলের পাশেই মুক্তধারার বই-এর স্টল। লোকজনের ভীড় সেখানেই বেশী। উদ্দেশ্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে খুব কাছে থেকে দেখা, একটু কথা বলা। ভক্তরা আসছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে বইগুলিতে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন - মনে হচ্ছে যেন কত দিনের পরিচয় এই ভক্তদের সাথে। পিছনের স্পিকারে খুব জোরে জোরে লালনের গান চলছে। এতকিছুর মধ্যেই পড়শী'র জন্য সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হয়ে গেলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ভক্তদের জন্য অটোগ্রাফ ও ছবি তোলার মাঝে মাঝে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে কিছু কথোপকথন -

পড়শী [প] : আপনার এই ৬ষ্ঠ বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে এসে কেমন লাগছে?

সুনীল [সু] : প্রথম কথা ভালো লাগছে যে, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে এখানে একটা উৎসব হচ্ছে যেখানে একসঙ্গে এত বাঙালী, সবাই বাংলা বই, বাংলা গান, বাংলা বক্তৃতা বা বাংলা উৎসব এইসব নিয়ে যে রয়েছে এতো একটা বাঙালীদের সমাবেশ। এটা দেখেই আনন্দ লাগছে। আমি অনেক বছর ধরেই আমেরিকায় আসছি। প্রথম দিকেতো এইসব কিছুই ছিল না। ফলে এইসব যে হচ্ছে এটা দেখেই খুব ভাল লাগে, আর যারা এইগুলো উদ্যোগ নিয়ে করছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প : আপনিতো অনেকদিন ধরেই লিখছেন। সময়ের সাথেসাথে পাঠকশ্রেণীর মন-মানসিকতার কি রকম পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনার মনে হয় ?

সু : পাঠকদের মানসিকতা বোঝা খুব শক্ত। কারণ লেখার সময়তো আমাদের ওটা খেয়াল থাকে না। খেলার সময় যেটা মনে আসে সেটাই লিখে যাই। কেউ কেউ অভিযোগ করে যে কেন আমি বেশী ইতিহাস নিয়ে লিখছি। আবার কেউ কেউ বলে– ইতিহাস নিয়ে লিখছেন আমাদের খুব উপকার হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে – কাজেই পাঠকের নানা রকম মতামত থাকে। কোন কোন পাঠক কবিতা ভালবাসেন। তারা অভিযোগ করেন, আপনি এখন কবিতা কম লিখছেন? আবার অনেক পাঠক আছেন কবিতা পড়েনই না। অনেকে জানেই না যে, আমি কবিতা লিখি। আবার আমি ছোটদের জন্যে লিখি। আমাকে একদিন একজন অনুরোধ করেছিল সব লেখা ছেড়ে দিয়ে- শুধু ছোটদের জন্য লিখুন। কাজেই এই রকমতো নানা রকম পাঠক আছে।

প : পশ্চিম বাংলার লেখকেরা যতখানি জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি পেয়েছেন, তাদের যত বই বাংলাদেশে পাওয়া যায় - সে তুলনায় আমাদের বাংলাদেশের লেখকরা কি পরিচিতি পেয়েছেন পশ্চিমবাংলায়? না পেয়ে থাকলে তার কারণ কি?

সু : এটা ঠিকই যে বাংলাদেশের লেখকরা পশ্চিম বাংলায় এখনও ততটা জনপ্রিয় হননি তবে পরিচিতি পেয়েছেন। কবিদের মধ্যে আমি বলবো যে, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ এঁরা বেশ পরিচিত। অনেকদিন থেকেই এদের বই বের হয়, ওখান থেকে। এখন বাংলাদেশের যারা জনপ্রিয় উপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক- তাঁদের লেখাও এখন পশ্চিম বাংলায় বেরুচ্ছে। যেমন দেশ পত্রিকাতে হুমায়ূন আহমেদের লেখা প্রতিবছর শারদীয় সংখ্যায় বের হয়। ইমদাদুল হক মিলনের লেখা প্রতিবছরই আমাদের আরেকটি পত্রিকা আনন্দলোকে বের হয়। এরকম অনেক বেরুচ্ছে, পরিচিতিটা আস্তে আস্তে হচ্ছে। হচ্ছে না যে, তা নয়। তবে এটা ঠিকই যে বাংলাদেশের লেখকদের বই বাংলাদেশে যতটা জনপ্রিয়, পশ্চিম বাংলায় ততটা জনপ্রিয় হয়নি।

প : 'পূর্ব-পশ্চিম', 'সেই সময়'এর মত উপন্যাস আপনার কাছে থেকে বহুদিন পাচ্ছে না বলে পাঠকদের অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের কি বলবেন?

সু : আমি আসলে ওগুলোকেও Masterpiece বলবনা, কারণ আমি নিজের লেখা সম্বন্ধে কোন দিনই তৃপ্ত নই। লেখাটা শেষ হবার পরেই মনে হয় যা লিখতে চেয়েছিলাম সেটা ঠিকমত পারিনি। পরবর্তী লেখার কথা চিন্তা করতে হয়। 'পূর্ব-পশ্চিম', 'সেই সময়' এর পরে আমি 'প্রথম আলো' বলে আরেকটি বই লিখেছি। এখন আমি এতবড় বই লিখছি না, কারণ এরকম বড় কিছু নিয়ে লিখতে হলে প্রথম বিষয়টা মাথায় আসা চাই। বিষয়টা মাথায় এলে, তারপর আমি পড়াশোনা করি, তারপর লিখি। আমি

এখন যেটা লিখছি, সেটা হলো একটা স্মৃতিকথা। আমার জন্ম থেকে অনেকদিন পর্যন্ত। এটা শুধু যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথাই তা নয়, আমি যে সময়টা পার হয়ে এসেছি, যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, বাংলাদেশের যুদ্ধ - এ সমস্ত ঘটনাগুলো যে ঘটেছে, তার যে অভিজ্ঞতা আবার একটা সময় আমি যে বেকার ছিলাম, আমাকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে, আমি আমেরিকায় এসেছিলাম থাকবার জন্য ৬০-এর দশকে, থাকতে পারিনি চলে গিয়েছিলাম- এ সমস্ত কিছুর সঙ্গে সঙ্গে সময়টাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। এটা একটা আত্মজীবনী, স্মৃতি কথা বা সময়ের চিত্র - সব মিলিয়ে একটা লেখা বলা যেতে পারে।

<u>সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :</u>

জন্ম : ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)। ফরিদপুর, বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত।
শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস 'ভয়ংকর সুন্দর'।
ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটো ছদ্মনাম - 'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে।
১৯৮৩ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ১৯৮৫-তে।

প : পড়শী সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

সু : আমি পত্রিকাটির উদ্বোধনের সময় বলেছিলাম কিছুটা। প্রথম কথা পত্রিকাটি বেশ অভিনব উদ্যোগ বলে মনে হয়েছে। কারণ আজকালকার ভালো ভালো ছেলেরা তো আর সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন পড়ে না। তারা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারী পড়ে বা এখন Information Technology, Computer-এ দক্ষ হয়। তারাও যে এখনও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বজায় রেখেছেন, তারাও যে এখনও একটা পত্রিকা প্রকাশ করার চিন্তা করেছেন- সেটাই আমার বেশ ভালো লেগেছে। উপদেশ দিয়ে কোন লাভ নেই। পত্রিকাটিকে যতদূর সম্ভব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। একটা পত্রিকা যদি অন্তত ৮/১০ বছর না বেরোয় তাহলে ঠিক তার প্রভাবটা পড়ে না। অনেক পত্রিকা বের হয় কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। সাবধানে থাকবেন – যেন দলাদলি না হয়। এটা পত্রিকার বেলায় খুব বেশী হয় - আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বন্ধুদের মধ্যে মতভেদ হয়, ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ হয়, তারপর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক থাকলে ভালো হয়। আর নিজেরা লিখুন। নিজেদের লেখা প্রকাশ করুন। অন্যদের কাছে বেশী চাইবেন না।

প : আপনার বইগুলো On-Line করার কোন চিন্তা ভাবনা হচ্ছে কি?

সু : কিছু কিছু উদ্যোগ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের জেনারেশন On-Line-এ লিখবে কিনা - আমি ঠিক জানিনা, কিন্তু পরবর্তী জেনারেশন হয়ত লিখবে। আমাদের এখনও তো যাদের কাছে কম্পিউটার আছে তাদের সংখ্যা ৫% ও হবে কিনা সন্দেহ। কাজেই আরও সময় লাগবে জিনিসটাকে চালু করতে। তবে কিছু কিছু উদ্যোগ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। banglaline.com বলে কলকাতা থেকে একটা পত্রিকা বের হচ্ছে। তাতে ইতোমধ্যে আমাদের কিছু কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে। তবে ভবিষ্যতে সরাসরি কাগজে কলমে আর লেখা হবে না বলে মনে হয়। একেবারে On-Line চলে যাবে। এটা হওয়া খারাপ নয়। আমার মনে হয় এটা হওয়া স্বাভাবিক। কাগজ বাঁচবে তো অন্তত। আর কাগজ বাঁচলে, গাছ বাঁচবে।

প : প্রবাসীরা কিভাবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভেতর বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে পারি? একই সঙ্গে জানতে চাইব বাংলা বইয়ের পাঠক সংখ্যা কি বাড়ছে না কমছে?

সু : এটা কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্ন নিয়ে অনেকেই চিন্তা করছেন। অনেক রকম আলোচনা হচ্ছে। পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করা খুব শক্ত ব্যাপার। পারা যাবে কিনা সন্দেহ। যাদের বাবা-মার খুব আন্তরিক চেষ্টা থাকবে, তারা কিছু কিছু হয়ত পারবে বেশীর ভাগই পারবে না। পরবর্তী প্রজন্ম বাংলা পড়বে না আমার ধারণা। কারণ এখানে এত পরিশ্রম করতে হয়, পড়াশোনার চাপ এত বেশী- তাছাড়া এখানকার মাটিতে নিজেদের পা সুদৃঢ় করার জন্যে তাদেরতো বাংলার দরকার হচ্ছে না। দরকার হচ্ছে তো ইংরেজীর। সুতরাং অনেকেই পারবে না। ধরে নিতে হবে যে এটাই নিয়তি।

আর বাংলা পাঠকের সংখ্যা সাধারণভাবে বাড়ছে, কিন্তু সেই বাড়াটার সঙ্গে আসলে কমার ইঙ্গিত আছে। তার মানে হচ্ছে কি জনসংখ্যাতো বাড়ছে। আগে যদি একটা বই একহাজার কপি বিক্রি হতো এখন হয়ত দেড় হাজার কপি বিক্রি হয়। কিন্তু জনসংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশী বেড়েছে। পাঠক যতটা বাড়া উচিত ছিল ততটা বাড়েনি। ইলেকট্রনিক মিডিয়া হয়ত তার আরেকটা কারণ। আর যারা বিদেশে চলে আসে তারাতো বই পড়ার সময় পায় না আর।

প: আপনার লেখা কোন উপন্যাসটি আপনার সবচেয়ে প্রিয়?

সু : আগেই বলেছি যে, কোনটাই প্রিয় বলতে পারিনা - কারণ কোনটা লিখেই আমি পুরো তৃপ্তি পাই না। লেখার পরে একটা অতৃপ্তির ভাব এসে যায়।

প : পড়শী'র পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ❐

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মোঃ জাফর উল-হ

আপনার মতামত জানিয়ে আমাদের লিখুন
ই-মেইল, ডাক অথবা ফ্যাক্সে
মতামত পাঠাতে পারেন
email : editors@porshi.com